দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবন-ভাবনায় প্রেম

প্রাকৃতিক ভাবে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দৈহিক ও মানসিক মিলনের বাসনার নাম প্রেম। প্রেম সম্পর্কে অবশ্য অসংখ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভাষান্তরে যাই বলা হ'য়ে থাকুক না কেন প্রেম সম্পর্কে, প্রেম বলতে মূলত আমরা নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক মিলনের ইচ্ছাকে বুঝিয়ে থাকি, অন্তত, প্রেমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই। সুভাবতই, এই প্রেম মানবজীবনের অন্যতম আদি ও আদিম একটি প্রবৃত্তি, তাই কোন মানুষের পক্ষেই এই প্রেমকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। জীবনের যেমন স্বাভাবিক কতকগুলি বিকাশের দিক থাকে, তেমনি প্রেমেরও কতকগুলি স্বাভাবিক প্রকাশের দিক আছে। প্রেম প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত, জীবনের মূল্যবান ঐশ্বর্য, তাই প্রেমের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

সম্ভবত এই কারণেই, মানব সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষ তার প্রেম মূল্যবান সম্পদ ব'লে মনে ক'রে এসেছে এবং প্রেমকে অবিস্মরণীয় রূপ দেবার জন্য তাকে রেখেছে সঙ্গীতে, শিল্পে ও সাহিত্যে। তাই দেখবো, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে ও শিল্পে প্রেম শিল্পী সমাজের অন্যতম প্রধান উপাদান, যাকে আশ্রয় ক'রে তাঁরা তাঁদের অমর সৃষ্টি করে গেছেন।

বলা-বাহুল্য, সাহিত্যকে যদি আমরা জীবনেরই প্রকাশ এবং রবার্ট ব্রিজেশের মতো কবির নিজের জীবনেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে করি, তাহলে একথা বলা অসঙ্গত হবে না, যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রেমের কবিতার জন্ম হয়ে থাকে। আমাদের বাংলা কাব্যের জয়দেব, চণ্ডীদাস

থেকে শুরু করে য়ুরোপীয় কাব্যের দান্তে, গ্যেটে, শেলী, বায়রণের মতো কবিদের দিকে তাকালে এ কথার তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে কীভাবে কবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেমকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে রূপ দিয়েছেন। এবং সেইসব কবি জীবন ও তাঁদের কবিতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যেতে পারে - কীভাবে সেইসব প্রেমের কবিতা তাঁদের জীবন থেকে উঠে এসেছে।

একথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আমরা একবাক্যে বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় প্রেমের যে একটি গভীর স্থান আছে, তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং অন্তত তার কিছু ঘটনা আলোচিত হওয়া উচিত তাঁর প্রেমের কবিতার উৎস বা সূত্র হিসেবে, নচেৎ, সমস্ত ব্যাপারটি নিছক একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পরিণত হবে। যেমন কেউ কেউ তেমন চেষ্টা করেছেন।[১] আমাদের বিবেচনায় অন্তত এমন ক্ষেত্রে, কবির জীবনকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা সম্ভবপর নয়, তা করা হ'লে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। যদি আমরা খোলা মনে ধরে নিই যে কবিরাও প্রাকৃত মানুষ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাঁদের ভালোবাসারও সামাজিক অধিকার রয়েছে তাহলে বোধ হয় যে কোন কবির জীবনে বিধৃত প্রেমের কাহিনীগুলি সহজভাবে গৃহীত হতে পারে। আমাদের অনেকেরই ধারণা, কবিরা সমাজের বিশিষ্ট জীব। সুতরাং, তাঁদের জীবনধারাও সেই পরিমাণে বিশিষ্ট এবং উচ্চমার্গের। এই ধারণা থেকেই আমরা ধরে নিই - কবিরা সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত এক

---

১. শ্রীমতী মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনা 'রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম' গ্রন্থটির কথা সুতই স্মরণে আছে। এই গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও দেখাননি - সেইসব প্রেমের কবিতা কীভাবে তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

অনির্বচণীয় অনুভূতির ও উচ্চমার্গের অধিকারী। ফলত, আমরা এক কাল্পনিক জগতে তাঁদের বসিয়ে রেখে তাঁদের একটি অশরীরী রূপে রূপায়িত করি। অথচ আমরা ভুলে যাই যে, প্রকৃতপক্ষে যে কবি যেমনই হ'ন না কেন, তাঁরা আসলে আমাদেরই মতো প্রাকৃত মানুষ, আমাদের মতো সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্য, ক্ষুদ্রতা-দীনতা, মহত্ত্ব, মহানুভবতা দিয়েই গঠিত তাঁদের জীবন। একজন সাধারণ মানুষ যেমন ক'রে বেঁচে থাকে সমাজ জীবনে, একজন কবিও একইভাবে জীবনযাপন করেন। সুতরাং কবিকে একটি কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা না ভেবে যদি আমরা স্বাভাবিক ভাবে সহজ চোখে তাঁদের দেখি, তবেই তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

এই কথাগুলি এমনভাবে স্পষ্ট ক'রে বলতে হল, তার কারণ ইতিমধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন প্রেমের ঘটনা নিয়ে অনেক myth তৈরী ক'রে ফেলেছি। আমাদের অনেক গবেষক-গবেষিকা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রেমের ঘটনা অবলম্বনে অনেক ইতিবৃত্ত রচনা করে ফেলেছেন। তাতে ফল হয়েছে এই, কেউ রবীন্দ্র নাথের প্রেমের ঘটনাগুলি দেখেছেন নৈসর্গিক ঘটনা হিসেবে। অথবা দেখেছেন নিষিদ্ধ ঘটনা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে কাউকে ভালোবাসা যে স্বাভাবিক, এই সহজ প্রতিপাদ্য যদি - এইসব লোকসমাজ মেনে নিতেন, তাহলে এই নিয়ে এত শোর-গোল তোলা প্রয়োজন হ'ত না।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর প্রেমের কথা বলে গেছেন। এবং এইভাবেই আমরা স্পষ্টত তিনজনের কথা জানতে পারি - যাঁদের সঙ্গে কবির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এঁরা হলেন যথাক্রমে আশা তড়খড়, বৌঠান কাদম্বিণী দেবী এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। আশা তড়খড়ের সঙ্গে কবির প্রেমকে বলা যায় কৈশোর প্রেম।

তাগিদ কবির দিক থেকে তেমন ছিল না, ছিল সেই মারাঠী মেয়েটির দিক থেকে। যিনি পরবর্তীকালে অকালে ঝরে পড়েন তাঁর অপূর্ণ প্রেমের বিরহ-যন্ত্রণায়। স্পষ্টত কবি কিছু না বললেও, জীবনস্মৃতির একটি মন্তব্যের ভিতর দিয়ে ('আমার সেই চব্বিশ বছর বয়েসের শোক') বুঝতে পারি - বৌঠানের সঙ্গে তাঁর কী গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া, প্রথম দিকের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের 'উৎসর্গও' প্রমাণ দিচ্ছে কবির এই ভালোবাসার। কাদম্বিণী দেবী কলংক এড়াবার জন্যে বাধ্য হয়েই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন, একথা বোঝবার জন্যে কোন ব্যাখ্যার দরকার হয় না। কবি অবশেষে, তখন তাঁর বয়স ষাট(৬০) পেরিয়ে গেছে। একজন বিদেশিনীর প্রেমে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দিক থেকেও সাড়া ছিল গভীর। সৌভাগ্যবশত, এ ক্ষেত্রে মৃত্যু এসে তাঁদের প্রেমকে ব্যাথা-বেদনায় ভরিয়ে তোলে নি।

অনুমান করা যেতে পারে, এই তিনজন মহিয়সী রমণীর সান্নিধ্য ছাড়াও কবি আরো অনেক রমণীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের সৌন্দর্য, অঙ্গ, কবিকে আনন্দ ও সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্পষ্টত এই তিন রমণীর প্রভাবের কথা স্বভাবতই ওঠে অর্থাৎ কীভাবে এঁরা কবির জীবনে স্থান পেয়েছিলেন, তা জানা দরকার। দেখা যাচ্ছে, আম্মা তড়খড় ও কাদম্বিণী দেবী - এঁরা দুজনেই অকালে লোকান্তরিত হন। অর্থাৎ একটি গভীর বিচ্ছেদের স্মৃতি রেখে যান এঁরা, কবির জীবনে, বিশেষত কাদম্বিণী দেবী। বৌঠানের মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয়। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছিল কবির, যদি চ সে বিচ্ছেদ মৃত্যু জনিত নয়, যেমন ঘটেছে অন্যদের ক্ষেত্রে।

এই তথ্য সামনে রেখে আমরা অনুমান করতে পারি - কবি এঁদের ভালো-বেসেছিলেন, কিন্তু এঁদের সঙ্গে সংসার-বন্ধনে বাঁধা পড়েননি। অর্থাৎ এঁদের প্রতি কবির যে প্রেম তা দেহবন্ধনে বাঁধা পড়েনি কখনো। অথচ, তাঁদের এই পারস্পরিক প্রেম কখনো মিথ্যে হয়ে যায় নি। বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই এই প্রেম কবির জীবনে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল। এর ফলে প্রেমের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যদি কবির জীবনে প্রেম সম্পর্কে কোন প্রত্যয় গড়ে ওঠে, তাহলে তার যে অন্য এক মূল্য আছে, তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, প্রেমের অস্তিত্ব কবি স্বীকার করে নিয়েও দেখেছেন - প্রেম নিছক দেহগত বন্ধনের ব্যাপার নয়, বরং যে প্রেম বিরহকাতর, বিচ্ছেদমণ্ডিত, তার প্রভাব যে অনেক বেশি, তার যাত্রা যে অনেক গভীর তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন :

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু সুস্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

- একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, প্রেম সম্পর্কে কবির ধারণার মূল উৎস এর মধ্যে নিহিত আছে। এবং প্রেম সম্পর্কে তাঁর এই প্রতীতি তিনি তাঁর নিজের জীবন থেকেই অর্জন করেছিলেন। এবং এই প্রতীতি থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের বৃত্তান্ত গড়ে উঠেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বস্তুত, রবীন্দ্রভাবনায় প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণের আগে তার উৎস সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার বিবেচনা করেই এই কথাগুলি উল্লেখ করা গেল।

যাইহোক, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, নারীর প্রেম ও সান্নিধ্য, অন্যান্য সকল মহৎ কবির মতোই রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করেছে। জীবনের বিভিন্ন

পর্বে এইসব নারীর পদসঞ্চার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কবিকে প্রেমের অনুভবে সাহায্য করেছে এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকেই যে তাঁর প্রেম সম্পর্কে একটা বোধ গড়ে উঠেছে, তা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়।

রবীন্দ্রভাবনায় প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবার জন্যে পূর্ববর্তী আলোচনাটি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ। পূর্বোক্ত আলোচনায় একথা বলতে চেয়েছি যে, জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রেম বিষয়ক যা কিছু লিখেছেন, কবিতা-গান অথবা অন্য রচনা, তা তাঁর জীবন-নিরপেক্ষ নয়, বরং সেইসব প্রকাশ তাঁর জীবনের গভীর মর্মমূলে নিহিত। অর্থাৎ কবি নিছক তত্ত্বের দিক থেকে প্রেমকে দেখেননি, তিনি নিজের জীবন-রসে রসায়িত ক'রে প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মূলত এখানেই তাঁর প্রেমধর্মী রচনাগুলির তাৎপর্য ও সার্থকতা।

অতঃপর, প্রেম সম্পর্কে কবির রচনার একটি নির্বাচিত তালিকা উপস্থাপিত করা গেল :

ক) কাব্য থেকে : -

রবীন্দ্ররচনাবলী : প্রথম খন্ড

সন্ধ্যাসংগীত

১. সন্ধ্যা - আয়ি সন্ধ্যে,

২. গান আরম্ভ - চারিদিকে ফেলিতেছে মেঘ

৩. অসহ্য ভালবাসা - বুঝেছি গো বুঝেছি সজনী

৪. হলাহল - এমন ক'দিন কাটে আর !

কড়ি ও কোমল

১. বাঁশি - ওগো শোনো কে বাজায়
২. যৌবন-স্বপ্ন - আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে
৩. ক্ষণিক মিলন - আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে
৪. গীতোচ্ছ্বাস - নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার
৫. স্তন - নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল
৬. চুম্বন - অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
৭. বিবসনা - ফেলো গো বসন ফেলো - ঘুচাও অঞ্চল
৮. বাহু - কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা
৯. চরণ - দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়
১০. হৃদয় - আকাশ - আমি ধরা দিয়েছি গো
১১. অঞ্চলের বাতাস - পাশ দিয়ে গেল চলি
১২. দেহের মিলন - প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
১৩. তনু - ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
১৪. স্মৃতি - ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
১৫. হৃদয় আসন - কোমল দুখানি বাহু শরমে
১৬. নিদ্রিতার চিত্র - মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার
১৭. পূর্ণমিলন - নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
১৮. শ্রান্তি - সুখ শ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়
১৯. বন্দী - দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ
২০. কেন - কেন গো এমন সুরে বাজে তবে বাঁশী
২১. মোহ - এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়
২২. পবিত্রপ্রেম - ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া

২৩. পবিত্র জীবন - মিছে হাসি মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন

২৪. মরীচিকা - এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুম শয়ন

মানসী

১. ভুলে - কে আমারে যেন এসেছে ডাকিয়া

২. ভুল-ভাঙা - বুঝেছি আমার নিশার স্বপন

৩. ক্ষণিক মিলন - একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া

৪. শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা - আবার মোরে পাগল করে দিবে কে ?

৫. আত্মসমর্পণ - আমি এ কেবল মিছে বলি

৬. নিষ্ফল কামনা - বৃথা ক্রন্দন

৭. সংশয়ের আবেগ - ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারিনে

৮. বিচ্ছেদের শান্তি - সেই ভালো, তবে তুমি যাও

৯. তবু - তবু মনে রেখো

১০. আকাঙ্খা - আর্দ্র তীব্র পূব বায়ু বহিতেছে বেগে

১১. নিষ্ফল প্রয়াস - ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন

১২. হৃদয়ের ধন - কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি -

১৩. নিভৃত আশ্রম - সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে

১৪. নারীর উক্তি - মিছে তর্ক - থাক্ তবে থাক্

১৫. পুরুষের উক্তি - সেদিন যে প্রথম দেখিনু

১৬. মানসিক অভিসার - মনে হয় সে ত যেন রয়েছে বসিয়া

১৭. পত্রের প্রত্যাশা - চিঠি কই ! দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো,

১৮. ব্যক্ত প্রেম - কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ - আবরণ ?

১৯. গুপ্ত প্রেম - তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে

২০. অপেক্ষা - সকল বেলা কাটিয়া গেল

২১. সুরদাসের প্রার্থনা - ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন

২২. ভৈরবী গান - ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি

২৩. নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ - বর। জীবনে জীবনে প্রথম মিলন

২৪. মায়া - বৃথা এ বিড়ম্বনা !

২৫. বর্ষার দিনে - এমন দিনে তারে বলা যায়,

২৬. ধ্যান - নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া

২৭. পূর্বকাশে - প্রানমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে

২৮. অনন্তপ্রেম - তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি

২৯. আশংকা - কে জানে একি ভালো ?

৩০. ভালো করে বলে যাও - ওগো, ভালো করে বলে যাও।

৩১. মেঘদূত - কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে

৩২. শেষ উপহার - আমি রাত্রি, তুমি ফুল।

৩৩. মৌণ ভাষা - থাক্ থাক্, কাজ নাই,

৩৪. আমার সুখ - ভালোবাসা ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি

সোনার তরী

১. নিদ্রিতা - রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে

২. দুর্বোধ - তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?

৩. ঝুলন - আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে

৪. হৃদয়-যমুণা - যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো,

৫. ব্যর্থ যৌবন - আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়

৬. ভরা-বাদরে - নদী ভরা কূলে কূলে

৭. প্রত্যাখ্যান - অমন দীন নয়নে তুমি
৮. লজ্জা - আমার হৃদয় প্রাণ
৯. নিরুদ্দেশ যাত্রা - আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে

চিত্রা

১. জ্যোৎস্নারাত্রে - শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
২. প্রেমের অভিষেক - তুমি মোরে করেছ সম্রাট
৩. স্বর্গ হইতে বিদায় - ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার মালিকা
৪. সান্ত্বনা - কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
৫. শেষ উপহার - যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে
৬. বিজয়িনী - অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যেদিন
৭. উৎসব - মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
৮. প্রস্তরমূর্তি - হে নির্বাক অচঞ্চল পাষাণ সুন্দরী
৯. নারীর দান - একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
১০. রাত্রে ও প্রভাতে - কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
১১. সিন্ধুপারে - পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লীমুখর রাতি,

চৈতালী

১. প্রেম - নিবিড় তিমির নিশা, অসীম কান্তার,
২. গান - তুমি পড়িতেছ হেসে
৩. প্রেয়সী - হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীনাবাদিনী,

কথা

১. পরিশোধ - রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,

কল্পনা

১. স্বপ্ন - দূরে বহুদূরে
২. চৌর পঞ্চাশিকা - ওগো সুন্দর চোর
৩. মদনভস্মের পূর্বে - একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
৪. মদনভস্মের পরে - পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
৫. মার্জনা - ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
৬. চৈত্র রজনী - আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
৭. স্পর্ধা - সে আসি কহিল, প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।
৮. পিয়াসী - আমি তো চাহিনি কিছু।
৯. পসারিণী - ওগো পসারিণী, দেখি আয়
১০. ভ্রষ্টলগ্ন - শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে
১১. প্রণয় প্রশ্ন - এ কি তবে সবি সত্য
১২. যাচনা - ভালোবেসে সখী, নিভৃত যতনে
১৩. বিদায় - এবার চলিনু তবে
১৪. নববিরহ - হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
১৫. লজ্জিতা - যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
১৬. মানস প্রতিমা - তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
১৭. সংকোচ - যদি বারণ কর, তবে
১৮. প্রার্থী - আমি চাহিতে এসেছি
১৯. সকরুণা - সখী, প্রতিদিন যায় এসে ফিরে যায় কে!
২০. বিবাহমঙ্গল - দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
২১. প্রকাশ - হাজার হাজার বছর কেটেছে।
২২. পূর্ণকাম - সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি

ক্ষণিকা

১. অনবসর - ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা
২. অতিবাদ - আজ বসন্তে বিশ্বধাত্রায়
৩. তথাপি - তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
৪. অপটু - যতবার আজ গাঁথনু মালা
৫. উৎসৃষ্ট - মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা
৬- ভীরুতা - গভীর সুরে গভীর কথা
৭. ক্ষতিপূরণ - তোমার তরে সবাই মোরে
৮. সোজাসুজি - হৃদয় পানে হৃদয় টানে
৯. অসাবধান - আমায় যদি মনটি দেবে
১০. দুইতীরে - আমি ভালোবাসি আমার
১১. ক্ষনেক দেখা - চলেছিলে পড়ার পথে
১২. অবিনয় - হে নিরুপমা
১৩. কৃষ্ণকলি - কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
১৪. ভর্ৎসনা - মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
১৫. আবির্ভাব - বহুদিন হল কোন্ ফাগুনে
১৬. কল্যাণী - বিরল তোমার ভাবখানি
১৭. অন্তরতম - আমি যে তোমায় জানি
১৮. সমাপ্তি - পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা

খেয়া

১. প্রতীক্ষা - আমি এখন সময় করেছি
২. গান শোনা - আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
৩. প্রচ্ছন্ন - কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি
৪. অনুমান - পাছে দেখি তুমি আসনি, তাই

বলাকা

৬ নং কবিতা - তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা

পূরবী

১. লীলাসঙ্গিনী - দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহি রে
২. বৈঠক পথের পথিক - বৈঠক পথের পথিক আমার
৩. বকুল বনের পাখি - শোনো শোনো ওগো, বকুল বনের পাখি
৪. পূর্ণতা - শুক্লরাতে একদিন
৫. আহ্বান - আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে
৬. লিপি - হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
৭. অপরিচিতা - পথ বাকি আর নাই তো আমার
৮. আনমনা - আনমনা গো, আনমনা
৯. বিস্মরণ - মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
১০. স্বপ্ন - তোমায় আমি দেখি নাকো,
১১. প্রকাশ - খুঁজতে যখন এলাম সেদিন
১২. কৃতজ্ঞ - বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল ছল আঁখি
১৩. দান - কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
১৪. ভাবীকাল - ক্ষমা করো, যদি গর্ব ভরে
১৫. শীত - শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
১৬. অতীতকাল - সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান
১৭. কিশোর প্রেম - অনেক দিনের কথা সে যে অনেকদিনের কথা
১৮. বিদেশী ফুল - হে বিদেশী ফুল যবে আমি পুছিলাম
১৯. অতিথি - প্রকাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
২০. অন্তর্হিতা - প্রদীপ কখন নিবেছিল

২১. আশঙ্কা - ভালোবাসার মূল্য আমায় দু-হাত ভরে
২২. শেষ বসন্ত - আজিকার দিন না ফুরাতে
২৩. বিপাশা - মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
২৪. প্রভাতী - চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি
২৫. মধু - মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
২৬. তৃতীয়া - কাছের থেকে দেয় না ধরা,
২৭. অদেখা - আসিবে সে, আজি সেই আশাতে
২৮. চঞ্চল - হায়রে তোরে রাখব ধরে
২৯. আকন্দ - সন্ধ্যা আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল
৩০. বিরহিনী - তিনবছরের বিরহিনী জানলাখানি ধরে
৩১. বনস্পতি - পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্ধ্বপানে
৩২. মিলন - জীবন মরণের স্রোতের ধারা
৩৩. বদল - হাসির কুসুম আনিল যে,
৩৪. ইটলিয়া - কহিলাম, 'ওগো রাণী',

মহুয়া

১. সন্ধান - আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
২. উপহার - মণিমালা হাতে নিয়ে
৩. শুভযোগ - যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
৪. মায়া - চিত্তকোণে ছন্দে তব
৫. প্রকাশ - আচ্ছাদন হতে
৬. বরণডালা - আজি এ নিরালাকুঞ্জে, আমার

৭. উদঘাত - অজানা জীবন বাহিনু
৮. অসমাপ্ত - বোলো তারে, বোলো
৯. নিবেদন - অজানা মণির নূতন মণির
১০. অচেনা - রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে
১১. অপরাজিত - ফিরাবে তুমি মুখ,
১২. নির্ভয় - আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
১৩. পথের বাঁধন - পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী
১৪. দূত - ছিনু আমি বিষাদে মগনা
১৫. পরিচয় - তখন বর্ষনহীন অপরাহ্ন নেমে
১৬. দায়মোচন - চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল
১৭. প্রতীক্ষা - তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে
১৮. সাগরিকা - সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে
১৯. বরণ - পুরাণে বলেছে
২০. পথবর্তী - দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে
২১. মুক্তরূপ - তোমারে আপন কোনে
২২. স্পর্ধা - শুষ্কপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা
২৩. বাণী - একদা বিজনে যুগল
২৪. দীমা - তোমারে সম্পূর্ণ জানি
২৫. সৃষ্টিরহস্য - সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে
২৬. পরিণয় - শুভ মন আসে সহসা আলোক জ্বেলে
২৭. মিলন - সৃষ্টির প্রাঙ্গনে দেখি
২৮. বাঁধন - তুমি বনের পূব পবনের সাথী

২৯. গুণ্ঠন - আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে
৩০. প্রত্যাগত - দূরে গিয়েছিলে চলি
৩১. বাসরঘর - তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
৩২. বিচ্ছেদ - রাত্রি যবে সাঙ্গ হল
৩৩. বিদায় - কালের যাত্রার ধ্বনি
৩৪. অন্তর্ধান - তব অন্তর্ধান পটে হেরি
৩৫. দিনান্তে - বাহিরে তুমি নিলে না

<u>পরিশেষ</u>

১. প্রতীক্ষা - তোমার স্বপ্নের দ্বারে
২. নির্বাক - মনে তো ছিল তোমারে
৩. মিলন - তোমারে দিব না দোষ

<u>পুনশ্চ</u>

১. ক্যামেলিয়া - নাম তার কমলা
২. সাধারণ মেয়ে - আমি অন্তঃপুরের মেয়ে
৩. শাপমোচন - গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়

<u>বিচিত্রিতা</u>

১. বধূ - যে চিরবধূর বাস
২. অচেনা - তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো
৩. আরশি - তোমার যে ছায়া
৪. [illegible] - হে উষা তরুণী

৫. হার - শুক্লা একাদশী

৬. ছায়াসঙ্গিণী - কোন ছায়াখানি

৭. প্রভেদ - তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ

৮. পুষ্পচয়িনী - হে পুষ্পচয়িনী

৯. ভীরু - কে এ কম্পিত প্রেম

১১. নীহারিকা - বাদলশেষের আবেশ

শেষসপ্তক

১ নং কবিতা - স্থির জেনেছিলেম

২ নং কবিতা - একদিন তুচ্ছ আলাপের

৩ ——— - ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন

১৩ ——— - রাস্তায় চলতে চলতে

১৪ ——— - কালো অন্ধকারের তলায়

৩০ ——— - যখন দেখা হল

সংযোজন

১. স্মৃতি পাথেয় - একদিন কোন তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে

বীথিকা

১. কৈশোরিকা - হে কৈশোরের প্রিয়া

২. সত্যরূপ - অন্ধকারে জানি না কে এল

৩. প্রত্যর্পণ - কবির রচনা তব মন্দিরে

৪. নিমন্ত্রণ - মনে পড়ে, যেন এককালে

৫. শ্যামলা - হে শ্যামলা

৬. পোড়োবাড়ী - সেদিন তোমার মোহ লেগে

৭. বিচ্ছেদ - তোমাদের দুজনের মাঝে

পত্রপুট

১৪ নং কবিতা - ওগো তরুণী

শ্যামলী

১. দ্বৈত - সেদিন ছিলে তুমি আলো -আঁধারের মাঝখানটিতে

২. সম্ভাষণ - রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে

৩. স্বপ্ন - ঘন অন্ধকার রাত

৪. হারানো মন - দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে

৫. অকাল ঘুম - এসেছি অনাহূত

৬. কণি- আমরা ছিলেন প্রতিবেশী

৭. মিলভাঙা - এসেছিলে কাঁচা জীবনের

৮. হঠাৎ দেখা - রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা

৯. অমৃত - বিদায় নিয়ে চলে আসবার

১০. দুর্বোধ - অধ্যাপক মশায় বোঝাতে গেলেন

১১. বঞ্চিত - কুলিনের বাড়ি থেকে এসেই দেখি

১২. শ্যামলী - ওগো শ্যামলী,

আকাশপ্রদীপ

১. কাঁচা আম - তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়

সানাই

১. আসা-যাওয়া - ভালোবাসা এসেছিল
২. যাবার আগে - উদাস হাওয়ার পথে পথে
৩. কৃপণা - এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে
৪. ছায়াছবি - আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
৫. দেওয়া নেওয়া - বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল
৬. মায়া - আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
৭. অদেয় - তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ
৮. বাসাবদল - যেতেই হবে
৯. শেষকথা - রাগ কর নাই কর
১০. মুক্ত-পথে - বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া
১১. দ্বিধা - এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
১২. আধোজাগা - রাত্রে কখন মনে হল যেন
১৩. পরিচয় - বয়স ছিল কাঁচা
১৪. সম্পূর্ণ - প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
১৫. হঠাৎ-মিলন - মনে পড়ে কবে ছিলাম
১৬. দূরবর্তিনী - যেদিন তুমি দূরের ছিলে মম
১৭. গান - যে ছিল আমার স্বপনচারিনী
১৮. অনসূয়া - কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ
১৯. শেষ অভিসার - আকাশে ঈশানকোনে
২০. অসমাপ্ত ছবি - আলোকের আভা তার অলকের চুলে
২১. গানের মন্ত্র - মাঝে মাঝে আমি যে তোমারে
২২. স্বপ্ন - জানি আমি, ছোট আমার ঠাঁই

রোগশয্যায়

৩৩ নং কবিতা - বহুকাল আগে তুমি

৩৪ নং কবিতা - যখন বীণার মোর আনমনা সুরে

আরোগ্য

১৩ নং কবিতা - ভালোবাসা এসেছিল

এই নির্বাচিত কবিতা-তালিকার বাইরেও অনেক কবিতা রয়ে গেছে যেগুলিকে প্রেম-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারতো। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রকাব্যের ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা এগিয়ে গেছে, তার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনেই প্রত্যেক কাব্যের প্রেম-সম্পর্কিত মুখ্য ও প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতাগুলি পূর্বোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান - প্রেম। এই প্রেম-সম্পর্কিত কবিতাগুলি সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য ও উপজীব্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যেও প্রেম সম্পর্কিত অনেক উপাদান ছড়িয়ে আছে। বিশেষত তাঁর গান, নাটক এবং উপন্যাসের মধ্যে। স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার আলোচনাও সূত্রই এসে পড়ে এবং যে কোন অর্থে সেগুলি মূল্যবান উপাদান। কিন্তু, যেহেতু আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়টি রবীন্দ্রকাব্যকে কেন্দ্র ক'রে বিধৃত, সেই কারণেই গান, নাটক বা উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ধারণা কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাবে না। শুধু, আলোচনার সমৃদ্ধির জন্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে ঐসব উপাদান উল্লিখিত হবে।

এই প্রস্তাবটি সামনে রেখে এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারি।

সাধারনতঃ যে কোন মহৎ লেখকের, বিশেষত কবির কাব্যালোচনায় তাঁর মানসিকতার প্রশ্ন তোলা হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, সব কবির ক্ষেত্রেই, কাব্যরচনার প্রাথমিক পর্বে রোমান্টিক মানসিকতা প্রকাশ পায়। তারপর, সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা যেতে পারে এ্যান্টি-রোমান্টিকতা। সম্ভবত, প্রথম জীবনে মানুষের প্রকৃতিগুলি গভীর আবেগে আচ্ছন্ন থাকে। ফলে স্বভাবতই তখন সমস্ত ধারণা থাকে সুপ্রময় কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পায় - যা' রোমান্টিকতার মূল কথা। কিন্তু কালক্রমে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মানুষ তার আবেগ হারিয়ে ফেলে, বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জর হ'য়ে মানুষ তার কল্পনার জগৎ থেকে দূরে সরে যায়। এই অবস্থায়, তার রোমান্টিক মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। মানবজীবনের এই সাধারণ সত্য কবিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরো এই কারণে যে, কাব্যের অন্যতম উপাদান কল্পনা বা *imagination* , রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, কবি বাস্তব - জীবনের সব কিছুই 'মনের মাধুরীতে' রচনা করেন - 'সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তোমারে রচনা।' এই মনের মাধুরীতেই সামান্য হয়ে ওঠে অসামান্য, তুচ্ছ হয়ে ওঠে মহৎ, শূণ্য হয়ে ওঠে পূর্ণ। এই মনের মাধুরীতেই পাড়ার লোকে যে মেয়েকে বলে 'কালো', সে কবির চোখে দেখা দেয় 'কৃষ্ণকলি' রূপে। কথা হচ্ছে, এই কল্পনাবিলাস, আবেগময়তা, মনের মাধুরী মানুষের জীবনে যেমন, তেমনি কবির জীবনেও চিরস্থায়ী হয়না, হয় না বলেই কবির প্রথম জীবনের কাব্যের স্বাদ পরবর্তী পরিণত জীবনের কাব্যে ফিরে পাওয়া যায় না।

প্রেমের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রেম জীবনের মহৎ ঐশ্বর্য। এ শুধু নর-নারীর দৈহিক মনের মিলনের ব্যাপার নয়। প্রেমের মধ্যে শরীরের একটা বড় স্থান

আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই শরীরকে অতিক্রম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে মন - যার বাহ্যিক পরিচয় থাকে না। বাউল বলেছে, 'আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে।' ঠিকই। নর-নারীও তার 'মনের মানুষের' অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে জীবনের পথে পথে। কেউ পায়, কেউ পায় না। যে পায়, তার জীবন হয় ঐশ্বর্যময়, যে পায় না - তার জীবন থেকে যায় শূণ্য, প্রেমের মধ্যে যে অমৃত থাকে, সে বঞ্চিত হয় সেই অমৃতের স্বাদ থেকে। বস্তুত, প্রেম জীবনের সেই অমৃত যা পেলে মানুষের জীবন হয় ধন্য, না পেলে হয় ব্যর্থ। তাই মানুষ তার জীবনে প্রেমকে এত মূল্য দিয়ে এসেছে, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে জীবনের পরম ঐশ্বর্য রূপে চিহ্নিত করেছে।

কবিদের ক্ষেত্রে এই প্রেম সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। কেন না, প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির উৎস। তাই পুরাণ কল্পনা করেছে প্রেমের দেবীর। তা কখনো দেখা দিয়েছে রতির বেশে। কখনো বা ভেনাসের। প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়, কবিরা প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তাই প্রেমের উচ্চ ও অমর স্থান আছে। এবং ধারাবাহিকভাবে তা একালেও সমান ভাবেই বিধৃত রয়েছে। কেন না, প্রেম হচ্ছে জীবনের একটি মৌলিক ধর্ম, যা কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। তাই প্রাচীন কাল থেকেই, ধ্রুপদী সাহিত্যেও, প্রেম হয়ে উঠেছে কাব্যের অবিচ্ছিন্ন অবশ্যম্ভাবী উপাদান। তাই, ঠিকমতো বলতে গেলে, প্রেমকে বাদ দিয়ে কাব্য গড়ে উঠতে পারে না।

শুধু কথা হচ্ছে, এই প্রেম কবির কাছে কী ভাবে ধরা দেয়। অর্থাৎ কোন একজন কবি কীভাবে প্রেমকে গ্রহন করেন তাঁর জীবনে এবং প্রেম সম্পর্কে কীভাবে তাঁর ধারণা বিধৃত হয়। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবই সবচেয়ে

বেশি ক'রে কার্যকরী হয়। মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দাস। এইসব উপাদান তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। প্রেমের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব থাকে স্বাভাবিক ভাবেই। এবং এসবকে কেন্দ্র করেই একজন মানুষের চোখে প্রেম ধরা দেয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এবং সেইভাবেই প্রেম সম্পর্কে তার ধারনাটিও গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের একদিকে যেমন তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁর কাব্যেও তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব থেকে গেছে। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, কৈশোরের থেকে সুরু করে কীভাবে কবি প্রেমের মুখোমুখি হয়েছেন। বিশেষভাবে একথা অনস্বীকার্য - বৌঠানকে তিনি প্রকৃত অর্থেই ভালোবেসেছিলেন, ভালোবাসা বলতে যা বোঝায়। জীবনের অপরাহ্নে তিনি একইভাবে বিদেশিনী ভিকেটোরিয়াকেও প্রকৃত অর্থে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। স্বভাবতই, এঁরা, এইসব মহীয়সী রমণী, যাঁরা তাঁর সামনে অমৃতময় প্রেমের পসরা সাজিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, কবির প্রেমকে উদ্দিপ্ত করেছিল, রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্য দিয়েই প্রেমের স্বাদ পেয়েছিলেন। স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার মূলে এঁদের প্রভাব নিহিত আছে।

এই কথাগুলি মনে রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার রূপটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে অন্যান্য ভাবনার মতো রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনায়ও একটি বিবর্তনের দিক আছে। স্বভাবতই এর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের যোগ আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কবিরা তাঁদের জীবনের প্রাথমিক লগ্নে যেসব প্রেমের কবিতা লেখেন কবিতার প্রকৃতির দিক থেকে যেগুলিকে বলা যায় রোমান্টিক প্রেমের কবিতা,

যার মুখ্য উপাদান হলো সৌন্দর্যবোধ ও বিরহ-বেদনা। সম্ভবত একেই বলা হয়েছে রোমান্টিক 'Agony', বিশেষ ভাবে যদি সৌন্দর্যের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে বলা যেতে পারে এই সৌন্দর্য প্রকৃতপক্ষে নারীর দেহলাবণ্য। স্বভাবতই তার আধার শরীর। এই সৌন্দর্য হয়তো বহুলাংশে 'মনের মাধুরী' কিন্তু কোনো কারণেই তা দেহ-নিরপেক্ষ নয়। বস্তুত কবিরা যে যুগে যুগে প্রেমের প্রশস্তিরচনা করে চলেছেন, হয়তো বা তার পালা কখনোই শেষ হবে না, - তা আসলে নারীর দেহ-সৌন্দর্যেরই স্তুতিবন্দনা। প্রাকৃতিক নিয়মে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। এবং সেক্ষেত্রে, নারী যেমন পুরুষের কাম্য, পুরুষও তেমনি নারীর কাম্য। নারী-পুরুষের এই কামনা সাধারণত দেহজ। কিন্তু পুরুষের চোখে বা কাছে নারী শুধু দেহের আকর্ষণ মাত্র নয়। নারীর মধ্যে পুরুষ খুঁজে পায় তার অন্তরের ধ্যানমূর্তি, তাই নারী পুরুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। একথা কবির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। নারীর সৌন্দর্য শুধু মাত্র বাহ্যিক শারীরিক সৌন্দর্যমাত্র নয়, তার অন্তরের সৌন্দর্যও কবিকে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে। শিল্পী যে যুগে যুগে নারীর মূর্তি রঙে রেখায় রূপায়িত করে চলেছে, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত। বস্তুত, নারীর শরীর একজন কবির কাছে অনুপম সৌন্দর্যের খনি। তাই বলা যেতে পারে, রোমান্টিক প্রেম হচ্ছে সেই প্রেম যে প্রেম কালগত নয়, বরং দেহের আধারে যা আবৃত থাকে।

এই কারণেই দেখতে পাই বলাকা-পূর্ব রবীন্দ্রকাব্য ধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা বহুলাংশে নারীর দেহজ সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্খার ও ব্যাকুলতার নামান্তর। পর্যায়ক্রমে কিছু নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

১। বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে -
বুক-ফাটা প্রাণ-কাটা ঘোর ভালবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
(অসহ্য-ভালোবাসা, সন্ধ্যাসংগীত)

২। ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়।
(বাঁশি, কড়ি ও কোমল)

৩। আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে ।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে ॥
(বিরহ, কড়ি ও কোমল)

৪। নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।
(স্তন , কড়ি ও কোমল)

৫। অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
(চুম্বন, কড়ি ও কোমল)

৬. ফেলো গো বসন ফেলো - ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
(বিবসনা, কড়ি ও কোমল)

৭. কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেয়ো না যেয়ো না।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
(বাহু, কড়ি ও কোমল)

৮. প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন যাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের তরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
(দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল)

৯. ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকশি।

চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।

(তনু, কড়ি ও কোমল)

১০. আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষান-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।

(শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা, মানসী)

১১. আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি - ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

(আত্মসমর্পণ, মানসী)

১২. ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।

(সংশয়ের আবেগ, মানসী)

১৩. তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে পুরস্কৃত কাহিনী কেবলি -
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেবে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি -
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

(তবু, মানসী)

১৪. কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি -
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিজল বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।

(হৃদয়ের ধন, মানসী)

১৫. কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন ?

(ব্যক্ত-প্রেম, মানসী)

১৬. তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে !
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে পিয়া কী দিয়ে !

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়
দাঁড়ায় থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায় ?
(গুপ্তপ্রেম, মানসী)

'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'মানসী' পর্যন্ত কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত যে উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রেমের কবিতার অভিজ্ঞান। এইসব কবিতায় একদিকে যেমন নারীর দেহের প্রতি গভীর আসক্তি, দৈহিক সৌন্দর্যের লীলাময়তার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, একই সঙ্গে তেমনি প্রেমের ব্যাকুলতা ও বিরহ-কাতরতা ফুটে উঠেছে। এই প্রেম-ভাবনা সম্পর্কে সেই কথাই বলা যায় যেকথা ম্যাথু আর্নল্ডের ফিলোমেলা বলেছিল - 'Passion, eaternal passion.' বস্তুত এই প্রেমভাবনা একদিকে যেমন রোমান্টিক অন্যদিকে তেমনি গভীর passion র প্রকাশ।

অতঃপর 'চিত্রা থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রেম-ভাবনার কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা গেল।

১. তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর, তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব
রাজ-আস্তরণে।
(প্রেমের অভিষেক, চিত্রা)

২. নিবিড় তিমির নিশা, অসীম কান্তার,
লক্ষ্য দিকে লক্ষ জনে হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথপানে
কার তরে, পান্থ তাহা আপনি যা জানে।
শুধু মনে হয়, চিরজীবনের সুখ এমনি ?
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসি মুখ।
কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ।

(প্রেম , চৈতালি)

৩. হে প্রেয়সী, শ্রেয়সী, হে বীণাবাসিনী,
আজি মোর চিত্ত পথে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ সুরসুধা,

(প্রেয়সী , চৈতালি)

৪. একি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিজুলি - উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার চঞ্চল ঝলকে,
এ কি সত্য ?
আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজ সম রক্ত,
হে আমার চির ভক্ত,
এ কি সত্য ?

(প্রণয় প্রশ্ন, কল্পনা)

৫. ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো - তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে -
তাহারি তালটি শিখিয়ো - তোমার
চরণ মঞ্জীরে।

(যাতনা, কল্পনা)

৬. ওগো কাজল, আমারে কাজল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, ভুলেছ -
কী কাতর গান গাই ?
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারি, আমার ভিখারি !

(ভিখারি, কল্পনা)

৭. আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে -
তাই আকাশ কুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন নিশায়ে ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।

(কাল্পনিক, কল্পনা)

৮. তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই -
এমন কথার দেব নাকো আভাসও,
আমারো মন তোমার পায়ে বাধা নাই।
(তথাপি, ক্ষণিকা)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনা এখান থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। আগেকার 'passion'-র পরিবর্তে একটি 'Sublimation' ফুটে উঠছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনা এখান থেকে মূর্ত দৈহিক সীমানা ছাড়িয়ে বিমূর্ত ভাবনার পথে এগিয়ে গেছে। আমরা যাকে ভাববাদী প্রেম বা বিমূর্ত প্রেম বলি কিংবা ভাষান্তরে যাকে Pletonic love বলা হয়, তার আভাস এখান থেকেই শুরু হয়েছে। এর কারণ হয়তো এই যে চিত্রা কাব্য রচনার আগে বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। বৌঠানের অস্তিত্ব এবং তাঁর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনায় একটা গভীর প্রভাব ফেলেছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বৌঠানের মৃত্যুর অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া কিভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা এই পর্যায়ের প্রেমের কবিতা গুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। আগেকার প্রেমের কবিতায় রক্ত-মাংসে গড়া জীবনের যে উষ্ণতা ছিল, সেই উষ্ণতা এখান থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, রবীন্দ্রনাথ 'মানসসুন্দরী' কবিতায় বলেছেন,

ঘরের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়,
বিশ্বের কবিতা রূপে হয়েছ উদয়।

এই উক্তির মধ্যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার যে পরিবর্তনের কথা বলতে চাইছি, তার স্বরূপ নিহিত। এককথায় বলা যায় প্রতিদিনের সান্নিধ্য বিধৃত

গৃহবদ্ধ বিশেষ প্রেমানুভূতির পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতি 'বিশ্বের কবিতা' অর্থাৎ নির্বিশেষ বিশ্বানুভূতিতে পরিণত হয়ে চলেছে। এরই প্রমাণ পাই 'বলাকার' ৬ সংখ্যক কবিতায় যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

'নয়ন সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

'ক্ষণিকা' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্ব পর্যন্ত কাব্যধারায় আমরা খুব একটা প্রেমের কবিতা পাই না। তার বদলে দেখি - বেশির ভাগ কবিতা ও গানের মধ্যে কবির এক অনুপম আধ্যাত্মচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। একথা বিশেষ করে খেয়া, নৈবেদ্য এবং গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথকে আগে মিস্টিক কবি' রূপে অভিহিত করা হ'ত। খুব সম্ভবত এর পিছনে আছে গীতাঞ্জলি -র প্রভাব। ঠিকমতো বলতে গেলে, পাশ্চাত্য দেশ গুলি রবীন্দ্রনাথকে জেনেছিল 'গীতাঞ্জলি'র কবি হিসেবে এবং গীতাখ্য রচনাগুলিতে অর্থাৎ গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য-এ কবির এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁদের এই জানাকে খুব একটা অসঙ্গত বলা যাবে না। কিন্তু আমরাও কি কবিকে এই পর্বে ঠিক সেইভাবেই পাই না ? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খেয়া-গীতাঞ্জলি পর্বে তো বটেই, এই সময়কার অন্যান্য রচনার মধ্যেও এই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ কবির চিত্তবৃত্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করছে এবং অসীমের সঙ্গে মিলনের আকুতিই তার মূর্ত প্রেরণা। এই কারণেই, সম্ভবত এর ফলেই জাগতিক ব্যাপারে কবির এক গভীর অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এই পর্বের রচনায়। এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে একথা এই পর্ব সম্পর্কে প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। এবং প্রেম যেহেতু মূলত জীবনের উত্তাপ, জীবনের উত্তাপ পূর্ণ একটি বাস্তব ও সীমায়িত ব্যাপার, তাই এই পর্বে স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের কবিতার দেখা পাই না কবির রচনায়।

কিন্তু কেন এমন হল ? এর পিছনে সম্ভবত দুটি কারণ নিহিত। প্রথমত, বৌঠানের আকস্মিক মৃত্যুর অভিঘাতে কবি নিজেকে লোকালয় - জীবনের বাইরে নিয়ে গেছেন, সংসারের প্রাত্যহিক দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। উত্তরবঙ্গে থাকার সময় এই সময়কার কবি-জীবনের দিনলিপি থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৌঠানের মৃত্যু তাঁকে ক্রমশঃ এক অন্য জগতে নিয়ে গেছে, যে জগৎ লোকায়ত জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জগৎ।

আর একটা কারণ এই যে, এই সময় কবির জীবনে একের পর এক মৃত্যু জনিত আঘাত নেমে আসতে থাকে। কন্যা, স্ত্রী ও পিতৃদেবের মৃত্যু স্বভাবতই কবিকে বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেই অসীমের জীবনে তিনি সমস্ত বেদনার সান্ত্বনা খুঁজেছেন। তাই, প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই সময়কার অধ্যাত্মচেতনা এবং সেই সূত্রে খেয়া - নৈবেদ্য - গীতাঞ্জলির ভুবন আসলে সেই জগৎ যেখানে কবি একটা বড় আশ্রয় পেয়েছেন, সমস্ত বেদনাকে অর্থপূর্ণ করতে চেয়েছেন।

এই কারণেই আমরা 'ক্ষনিকা' পরবর্তী কাব্যধারায়, 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত, প্রেমের কবিতার অভাব লক্ষ্য করি।

কিন্তু আবার, 'বলাকা' থেকে কবি আস্তে আস্তে গীতাঞ্জলি পর্বের ভাবানুষঙ্গ থেকে মুক্ত হ'য়ে মর্ত জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং সেই সূত্রে, 'বলাকা' - উত্তর কাব্যধারায় আবার আমরা ক্ষনে ক্ষনে প্রেমের কবিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাই।

এখানে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্টতার কথা তোলা যাক্। রবীন্দ্রকাব্যকে আমরা, মাঝখানে বলাকাকে রেখে, দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি, বলাকা-পূর্ব ও বলাকা-উত্তর কাব্যধারাকে এ্যান্টি-রোমান্টিক পর্ব আখ্যা দিতে পারি। স্টিফেনস্পেন্ডার

ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌সের কাব্যধারাকে এইভাবেই ভাগ করেছেন। ইয়েটসের পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কাব্যধারা এ্যান্টি-রোমান্টিক। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা পুরোপুরি এই রকমই কিনা, হয়তো সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু 'মানসী'- 'চিত্রা'- 'কল্পনা'র রোমান্টিক ঘনঘটা যে বলাকা উত্তর কাব্যধারায় নেই, তা তো প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই কারণেই, বলাকা-উত্তর কাব্যধারায় যে প্রেমের কবিতা পাই অর্থাৎ রবীন্দ্র নাথের প্রেম ভাবনার পরিচয় পাই, তা আগেকার তুলনায় ভিন্ন, নতুন এক স্বাদের অভিব্যক্তি। এই সব প্রেমের কবিতার সাধারণ পরিচয় হলো এই, তারা যতটা রূপময়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবময় ও অনুভূতি প্রধান। এই পর্বের প্রেম-ভাবনা এই ভাবেই প্রকাশ লাভ করেছে।

ধরা যাক 'বলাকার' ৬ সংখ্যক অর্থাৎ 'ছবি' কবিতাটির কথা। আগেই এই
কবিতার কথা উদ্‌ধৃত হয়েছে। বলতে গেলে - বৌঠানের সঙ্গে তাঁর যে প্রণয়, কবি তাকেই, তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে এই কবিতায় নতুন ক'রে তুলে ধরেছেন। স্বভাবতই, তিরিশ বছর পরে কবির সামনে থেকে বৌঠানের 'ঘরের বনিতা' রূপ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, তার বদলে অন্তরে জেগে উঠেছে তাঁর ভাবরূপ যাকে তিনি প্রকাশ করেছেন এইভাবে -

'শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল'।

বলা বাহুল্য, এই প্রেম কখনো রোমান্টিক হ'তে পারে না। ঐ প্রেম বিশুদ্ধ একটি অমৃত প্রেমের ভাবনার প্রকাশ। এই প্রেমে বেদনাবোধ বা 'রোমান্টিক এ্যাগনি' প্রায় নেই, বরং বেশ একটা সান্ত্বনা, বেশ একটি অর্থময় তৃপ্তি ফুটে উঠেছে। যেন, প্রেমের মধ্যে জীবনের এক গূঢ় চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছেন।

'পূরবী' এবং 'মহুয়া' কাব্য দুটিকে প্রেমের কাব্য বলাই সঙ্গত। 'পূরবী' কাব্যের মোট ৭৭টি কবিতার মধ্যে ৩১টির মতো কবিতাই প্রেমের কবিতা। 'মহুয়ার' তাই। এই কাব্যে মোট কবিতা রয়েছে ৮৬টি, তার মধ্যে এক চতুর্থাংশ কবিতাকে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

'পূরবী' কাব্য রচনাকালে কবি রয়েছেন আর্জেন্টিনার 'বুয়েনোস এয়ারিশ'-এ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য ও সেবায়। এই কাব্যের একাধিক কবিতা এই মহিয়সী নারীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এবং আজ আমরা জেনেছি, প্রকৃত অর্থেই কবি ভালোবেসেছিলেন ওকাম্পোকে। ওকাম্পোর সঙ্গে কবির প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সাম্প্রতিক কালে অনেক লেখা রয়েছে। স্বয়ং ওকাম্পো ১৯৬১ (১৯৬৪) সালে সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত 'টেগোর সেন্টিনারী কম্মেমো রেশন ভল্যুম'-এ স্মৃতিচারণমূলক যে লেখাটি লিখেছিলেন, তার ভিতর থেকে এঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিবিড়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানটির প্রসঙ্গ এই সূত্রে উল্লেখ করতেই হয়।

কিন্তু এখানেও সেই পুরোনো প্রেম বিধৃত হ'তে দেখি এবং 'লীলাসঙ্গিনী' ও 'কৃতজ্ঞ' কবিতাদুটির প্রাসঙ্গিকতা প্রায় অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের শেষ বেলাকার প্রেম-ভাবনার আলোচনায়। কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

১. দুয়ার - বাহির যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি -
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে ?
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধু রে ?

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে -

বাজাইলে কিঙ্কিনী।

বিস্মরণের গোধূলি ক্ষনের

আলোতে তোমারে চিনি।

(লীলাসঙ্গিনী , পূরবী)

২. আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব হানি, - সবচেয়ে হানি তুমি ছিলে একদিন।

(কৃতজ্ঞ, পূরবী)

এগুলির পাশাপাশি আর একটি উদ্ধৃতি অপরিহার্য :

৩. সেই সেদিনের আসা যাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।
এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরণ দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

(কিশোর প্রেম, পূরবী)

'পূরবীর' পরেও কবিকে একাধিক কবিতা লিখতে দেখি যার বিষয়বস্তু প্রেমই অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শেষ বেলাকার কাব্যধারাতেও প্রেমের স্রোত শুকিয়ে যায় নি। 'মহুয়া' কাব্যে অন্তত ২০টি কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলাই সঙ্গত। 'পুনশ্চ' কাব্যের নানা কবিতায় প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে। বিশেষত - ৩টি কবিতায় : ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে এবং শাপমোচন। 'বিচিত্রিতা'-তে পাই এই ধরণের ১১টির মতো কবিতা। 'শেষ সপ্তক' কাব্যে স্পষ্টত ৬টি কবিতাকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। 'বীথিকায়' রয়েছে ১টি কবিতা, এগুলিও আসলে প্রেমের কবিতাই। 'পত্রপুট' কাব্যের ১৪ সংখ্যক কবিতাকেও একইভাবে চিহ্নিত করা যায়। তেমনি 'শ্যামলী' কাব্যে সরাসরি ১৩টি প্রেমবিষয়ক কবিতা পাচ্ছি। 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি প্রেমের কবিতা রয়েছে। এদিক থেকে, শেষ পর্যায়ের অর্থাৎ গোধূলিলগ্নের কাব্যধারায় 'সানাই' কাব্যটির একটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে, ২৪টি প্রেমের কবিতা এই কাব্যের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। এরপরে, 'রোগশয্যায়' এবং 'আরোগ্য' কাব্য দুটিতে যথাক্রমে ২টি এবং ১টি প্রেমের কবিতা রয়েছে। 'পূরবীর' পরবর্তী 'মহুয়া' থেকে 'আরোগ্য' পর্যন্ত কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার চিহ্নস্বরূপ কীভাবে প্রেমের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে, তার একটি পরিচয় দেওয়া গেল।

এখন কথা হচ্ছে, এগুলি কী ধরণের প্রেমের কবিতা ? অন্যভাবে বলতে গেলে, শেষ বেলাকার কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা কোন্ রূপ পরিগ্রহ করেছে ? 'পূরবী' রচনার সময়, সম্ভবত শেষবারের মতো, কবিকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মতো রমনীকে ভালবাসতে দেখি। লৌকিক অর্থে ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, রবীন্দ্রনাথ সেইভাবেই ওকাম্পোকে ভালোবেসেছিলেন, একথা মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নেই। য়ুরোপে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রয়েছে। আমরাই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে প্রেমকে কখনো সহজ চোখে দেখতে পারিনি, সহজ ভাবে নিতে শিখিনি। ফলে, প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা তাকে জটিল করে তুলি, বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন তুলি। প্রেম যে

প্রকৃতপক্ষে জীবনের এক মহৎ ঐশ্বর্য, জীবনের অনুপম প্রেরণা, এই সহজ সত্য আমরা মেনে নিতে শিখিনি। ফলে, প্রেমের চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার রচনা ক'রে তাকে জীবন থেকে আড়াল ক'রে রাখতে পারলে যেন বেঁচে যাই, এমনই আমাদের অবস্থা।

বস্তুত, 'পূরবীর' প্রেম-ভাবনা যে সরাসরি কবির জীবন থেকে উঠে এসেছে, তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু 'মহুয়া' 'সানাইয়ের' প্রেমের কবিতা ? এসব কবিতার উৎস বা প্রেরণা কী ? এসব কবিতার ও উৎস কবির ব্যক্তি-জীবন, তবে একটু অন্যরূপে, বহুলাংশে স্মৃতিচারণের সূত্রে। 'পূরবী'-পরবর্তী কাব্যধারায় যেসব প্রেমের কবিতা দেখি, সাধারণভাবে বলা যায়, সেইসব প্রেমের কবিতার স্বাদ পূর্ববর্তী কবিতার চেয়ে স্বতন্ত্র। আসলে 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' পর্যন্ত কাব্যধারায় প্রেমের কবিতা ছিল মূলত Sensuous, তারপরের পর্যায়ের প্রেমের কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে Sublimated এবং সেটা শুরু হয়েছে 'বলাকা' থেকেই। তবু, 'পূরবীতে'ও আমরা যে প্রেমের কবিতা পাই, যেহেতু সেই প্রেম ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাই তার মধ্যেও অনেক পরিমাণে Sensuousness ছিল। কিন্তু অনতিপরে, 'মহুয়া' থেকে শেষ পর্যায়ের অন্যান্য কাব্যে বিধৃত প্রেমের কবিতা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এক Sublimated রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যক্তি কবির সামনে না থাকার ফলে, গভীর আবেগ থাকা সত্ত্বেও এইসব প্রেমের কবিতায় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এক বিশ্বজনীন যাত্রা যুক্ত হয়েছে যেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাক :

১. এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আনিবে যে শ্রেষ্ঠ ফলগুলি;

কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তারে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রানীর পারিজাতসম।
পায়ে দিব তার
যে-এক-মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।
(উপহার)

২. ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জয়।
বিঘ্ন-ভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলি ঘাতে হবে না নিষ্ফল।
(অপরাজিত)

৩. আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুখ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে

ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

(নির্ভয়)

৪: পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত ।

(পথের বাঁধন)

৫. সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয়নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি দেওয়া সুপারির আন্দোলিত - সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে

(পরিচয়)

৬. চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাজল, -
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল,
তার পরে যদি তুমি ভোলো

মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

(দায়মোচন)

৭. নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

(প্রতীক্ষা)

৮. মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বলব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে তা
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে ক্ষয়।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহন করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

(বিদায়)

উপরোক্ত নির্বাচিত উদ্‌ধৃতিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখবো, প্রবল passion বা উন্মাদনা সত্ত্বেও এ প্রেম আসলে ঘনীভূত অনুভূতির আকার নিয়েছে। টুকরো টুকরো স্মৃতির স্পর্শে যদিচ এই প্রেমের অভিব্যক্তি কোথাও কোথাও উত্তাপময়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, আগে যেমন বলেছি, প্রেম sublimated হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। আগেকার প্রেমের কবিতায় যৌবনের যে উত্তপ্ত অনুরাগ ফুটে উঠেছে, এইসব কবিতায় সেই উত্তাপ বা উন্মাদনা নেই। আসলে, কবি যতোই জীবনের শেষ সিঁড়িগুলি একটার পর একটা পার হয়েছেন, ততই তাঁর চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। দুঃখবেদনাও প্রশান্ত রূপ নিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। এই পর্যায়ের কবির প্রেম ভাবনা তাই এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে।

'মহুয়ার' পরেও, শেষ বেলাকার কবিতাধারায় আমরা কৃচিৎ প্রেমের কবিতা দেখি না যে তা নয়, তবে তার সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তারই মধ্যে সম্ভবত শেষবারের মতো, 'সানাই' কাব্যে শেষ প্রদীপ-শিখার মতো কবির প্রেম-ভাবনা অভিব্যক্ত হয়েছে। 'মহুয়ার' সঙ্গে 'সানাই'য়ের কালগত ব্যবধান খুব কম নয়। এবং 'সানাই' কাব্যকে আমরা আর এক রূপে দেখতে অভ্যস্থ। সেটা হচ্ছে এই যে, 'সানাই' কাব্যে-ই কবি কবিতা থেকে গান এবং গান থেকে কবিতায় রূপান্তরের এক অতুলনীয় ছবি তুলে ধরেছেন। অথচ, আমাদের লক্ষ্য করা উচিত - এই কাব্যটি কবির প্রেম-ভাবনার দিক থেকেও বিশেষভাবে স্মরণীয় কাব্য। কাব্যটির রচনাকালের দিকে লক্ষ্য রেখে স্পষ্ট - তাই বলা যায় যে, 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' কাব্যের প্রেমভাবনার অস্তিম স্বাক্ষর রয়ে গেছে এই কাব্যে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কবির প্রেম-ভাবনা সূচক কয়েকটি নির্বাচিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

ক) ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে সুপ্ত হয়েছিল মনে,
দিইনি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে সুপ্ত কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপ শিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

(আসা-যাওয়া)

খ) উদাস হাওয়ার পথে পথে
যুকুলগুলি ঝরে,
কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি তাই
লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমায় স্মরণ করে।
(যাবার আগে)

গ) আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।
(ছায়াছবি)

ঘ) পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।
(মানসী)

ঙ) আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া

কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।
সুপুরুষিনী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।

(মায়া)

চ) সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের-অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে।
দেখা হয়েছিল না কি কোনো এক সংগীতের পথে দূরে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে।

(গানের স্মৃতি)

ছ) যে ছিল আমার স্বপনচারিনী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভ খনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে,
তোমারে পেরেছি বুঝিতে।

(গান)

জ) এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত

এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে - বৈভব -
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

(অসম্ভব)

ঝ) তাই তো বলি, প্রিয়ে,
হাসিমুখে বিদায় কোরো সুন্দ কিছু দিয়ে,
সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে
আনিয়া দেয় ধীরে
সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন হাসিটিতে।

(সুন্দ)

এই নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না, কবি তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে শেষবারের মতো পিছনে তাকিয়ে প্রথম জীবনের প্রেমের স্বাদ নিতে চাইছেন। গোটা সানাই কাব্যে একটি মুখের ছবি নেপথ্য থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। সেই মুখ কি বৌঠান কাদম্বিনী দেবীর নয় ? বস্তুত, এই কাব্য প্রেমের অসংখ্য স্মৃতিতে পরিপূর্ণ এক অনবদ্য কাব্য। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ লগ্নে বারংবার কবিকে স্মৃতিরোমন্থনে মগ্ন হতে দেখি। যতই দিন চলে যাচ্ছে, একটু একটু করে পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় এগিয়ে আসছে, কবি তত বেশি ক'রে অতীতাচারী হয়ে পড়েছেন, মনে মনে পিছনের স্মৃতিকে স্মরণ করবার চেষ্টা ক'রে চলেছেন, যেন তাঁর নতুন কথা বলার আর কিছু নেই। তাই বোধহয় যেতে যেতে 'ফিরে ফিরে' চাইছেন পিছনের দিকে। মনে হয় সেই কারণে, 'সানাই' কাব্যে আমরা কবিকে শেষবারের মতো প্রেমের অজস্র স্মৃতির মধ্যে অবগাহন করতে দেখি। এই স্মৃতিচারণের মধ্যে কোন বেদনা নেই, কোন দুঃখ নেই, কোন রিক্ত-তাও নেই, যেন সহজ মনে সব কিছুকেই তিনি সহজভাবে গ্রহন করেছেন, যেন সব কিছুকেই শেষ-বারের মতো দু'চোখ মেলে দেখে নিচ্ছেন। বলা যেতে পারে, 'সানাই' কাব্যে বিধৃত প্রেমের কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার অন্তিম পরিণতি।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার অভিব্যক্তি যেমন কাব্যের ভিতর দিয়ে ঘটেছে, তেমনি তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও স্বভাবতই এই প্রকাশ লক্ষ্য করি, বিশেষত গানে ও নাটকে এবং গল্প-উপন্যাসে। অথবা, নানা সূত্রে বিভিন্ন রচনায়, চিঠিপত্রেও তিনি প্রেম সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সন্দেহ নেই, সেইসব অভিব্যক্তিও তাঁর প্রেম-ভাবনার অন্তর্গত। তফাৎ এই, কাব্য যেহেতু মূলত তাঁর নিজের জীবনেরই অভিব্যক্তি। তাই কাব্যে বিধৃত প্রেম-ভাবনা তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, একথা তাঁর গানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কবিতায় ও গানের ভিতর দিয়ে প্রেমানুভূতি বা প্রেমভাবনার যে অভিব্যক্তি, তা সরাসরি কবির জীবন থেকে উঠে এসেছে। অন্যদিকে, অন্যান্য রচনায়, যেমন নাটকে, কথাসাহিত্যে কবি যেভাবে প্রেমকে দেখেছেন, তা নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ সেইসব প্রেমের রূপায়ণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তথাপি, একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, সেইসব প্রেম-চিত্রনের মধ্যেও আসলে কবির সেই বক্তব্যই ফুটে উঠেছে, যে বক্তব্য বা অভিব্যক্তি আমরা কাব্যে লক্ষ্য করি। অর্থাৎ, সহজভাবে বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার যে রূপ আমরা তাঁর কাব্যে দেখি, তাই অন্যভাবে অন্যরূপে গানে, নাটকে বা অন্য রচনায় রূপায়িত হয়েছে।

বস্তুত, প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমাস করলে বলা যায়, প্রেম মানুষকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দেয়, এবং এখানেই প্রেমের সবচেয়ে বড় চরিতার্থতা। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন যে প্রেম হচ্ছে নৌকোর গুন টানার মতো। নৌকোর গুণ যেমন নৌকোকে বেঁধে রাখে না এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি প্রেমও মানুষকে সংসারের অসার বন্ধনে বেঁধে রাখে না, তা মুক্তি দেয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আবার অন্যত্র, 'শেষের কবিতায়' অমিতের মুখ দিয়ে কবি বলছেন, ভালোবাসা বা প্রেম হচ্ছে সুপুলোকে দীঘির জলে সাঁতার কাটার মতো। তা ঘড়ায় তোলা জলের মতো নয়। তা দৈনন্দিন প্রয়োজনে আসে না, কিন্তু মন তাতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের মুক্তির স্বাদ পায়। এইভাবে

রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জীবনের এক পরম ঐশ্বর্য ব'লে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্য প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য নয়। এ ঐশ্বর্য মনের গহনে সযত্নে লালন-পালন করার উপাদান। কাজেই জীবনের স্থূল প্রয়োজন থেকে তিনি প্রেমকে সরিয়ে নিয়ে তার জন্য একটি নিভৃত স্থান করে নিয়েছেন - সেই নিভৃত স্থান হচ্ছে মানুষের অন্তর, বাইরে যার প্রকাশ নেই। 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা একসময় রাজাকে বাইরে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজার সঙ্গে তার সেই বাহ্যিক মিলন ঘটল না। তাদের মিলন হলো অন্ধকারে। অমূর্ত রাজার রূপ সুদর্শনা সেইভাবেই দেখেছে। এর ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার এক সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন, প্রেমের সার্থকতা, চরিতার্থতা অন্তরের নিভৃত গভীরে, তাই মূলত বিমূর্ত। এবং বাইরে থেকে প্রেমের স্বরূপ বোঝা যাবে না। তাই প্রেম যখন অন্তরের ঐশ্বর্য হয়ে দেখা দেয়, তখন সেই প্রেমে মানুষ হ'য়ে ওঠে মহৎ, সেই প্রেম মানুষকে দেয় পরম সান্ত্বনা, তৃপ্তি ও অমৃত। সেই প্রেম হ'য়ে ওঠে মানুষের পরম আশ্রয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনেও একই ভাবে প্রেমকে পেয়েছেন। প্রেম তাঁকে ক্ষনে ক্ষনে যারা জীবন সেই আশ্রয় দিয়েছে। এবং সেই নিশ্চিত আশ্রয়েই বিধৃত হয়েছে তাঁর জীবন। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে, তাই তিনি ধন্য, তাই তিনি মহৎ হ'য়ে উঠেছেন। প্রেমই যে তাঁকে অনির্বচনীয় জগতের সন্ধান দিয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। অথবা একথাও বলা যায় যে, তাঁর এই মানবী প্রেম যা মূলত চিরন্তন নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে বিজড়িত। তা নানা আধারে সঞ্চারিত হয়ে গেছে - কখনো প্রকৃতির মধ্যে, কখনো অরূপ বা ঈশ্বরের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের চোখে নারীর রূপটি কেমনভাবে ধরা পড়েছে, তা'ও উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি, নারী ও পুরুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এক শাশ্বত

সত্য ও সমস্যা। এ সমস্যা যেমন মানবজীবনের, তেমনি সাহিত্যেরও। বস্তুত, কাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। আমাদের ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে এই সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভারতীয় পুরাণেও নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক ইতিবৃত্ত রচিত হতে দেখি। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এই বিষয়টি। কালিদাসের কাব্যে নারীর রূপ ও প্রেম এক অনুপম অনির্বচনীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যেও প্রেম একটি বিশিষ্ট উপাদান। সেখানে বলা হয়েছে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' হচ্ছে কাম এবং 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' হচ্ছে প্রেম। বলতেই হচ্ছে, পরিপূর্ণ মানবিক প্রেম বলতে যা বোঝায় তা খুব একটা মূল্য বা স্বীকৃতি পায়নি এসব ক্ষেত্রে বা ভাবনায়।

বস্তুত, ঐতিহ্য সূত্রে ও প্রথাগতভাবে বিধৃত নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও প্রেম সম্পর্কিত আমাদের ভাবনা শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যের স্পর্শেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে উনিশ শতক থেকে। তখন থেকেই আমরা প্রেম সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রথাগত চিন্তার বাইরে এসে নতুন ক'রে ভাবতে শিখেছি। প্রেম নারী-পুরুষের জীবনের একটি মৌলিক অভিব্যক্তি এবং তা সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা শাসিত নয়। এই ধারণা নিতান্তই একালের। রবীন্দ্রনাথ এই মানসিকতা থেকেই প্রেমকে দেখেছেন এবং নারীর প্রেমের মধ্যে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য অনুভব করেছেন। বলা বাহুল্য, এই মাধুর্য যুগপৎ দেহ ও মনের। রবীন্দ্রনাথ দৈহিক সৌন্দর্যকে যেমন নারীর পরম ঐশ্বর্য বলে মনে করেছেন, তেমনি তাঁর অন্তরের মাধুর্যকেও পুরুষের জীবনে পরম কাম্য ব'লে গণ্য করেছেন। ফলত, নারীর প্রেম তাঁর চোখে কেবল বিশুদ্ধ শারীরিক ব্যাপার নয়। তেমনি তা পরিপূর্ণ নিরাবয়বও নয়। নারীর প্রেম তার বাহির ও অন্তরের সৌন্দর্যে মণ্ডিত এক পরম ঐশ্বর্য। রূপ বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা, নারীর বাহ্যিক লাবণ্য ও অন্তরের মাধুর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একবার 'সানাই'য়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছে করে। সারা জীবন তিনি ভালোবেসেছেন, তিনি ভালোবাসা পেয়েওছেন। অথবা অন্যভাবে নারী-পুরুষের ভালোবাসার বিচিত্র দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন। স্বভাবতই প্রেম সম্পর্কে তাঁর একটা উচ্চ ধারণা থাকারই কথা। প্রেমের মধ্যে তিনি যদি একটা *metaphysical* কোন সত্য অনুভব ক'রে থাকেন তাহলে বলবো, তা সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে।

এত সত্ত্বেও, তবু আমরা সানাইয়ের 'আসা-যাওয়া' শীর্ষক ছোট্ট কবিতাটির দিকে বিস্ময়ভারা দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারি না। এই কবিতাটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার অন্তিম পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সমগ্র সানাইকাব্যে একের পর এক যেসব কবিতা লিখেছেন প্রেমকে উপজীব্য করে, মনে হয়, এই চূর্ণক কবিতাটি যেন তারই প্রতীক রূপ। এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য আমাদের অবাক করে দেয়। কেননা কবির কাছে প্রেম শেষপর্যন্ত 'সুপ্তকায়াহীন' 'একটি রক্তিম মরীচিকা' ব'লে মনে হয়েছে। ঋষি দার্শনিকদের মতো রবীন্দ্রনাথও তো আসলে জীবনের রহস্যকে জানতে চেয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু, জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে জীবন শেষ পর্যন্ত রহস্যময়ই থেকে গেল। ('তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি। বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী) তাঁর কাছে একইভাবে যে প্রেমকে তিনি সারাজীবন একটি উচ্চ মার্গ থেকে লালন-পালন করেছেন, সেই প্রেমও তাঁর কাছে অচেনা-অধরা থেকে গেল এবং 'রক্তিম মরীচিকার' জাল বিস্তার করে রাতের অন্ধকারে দূরে বিলীন হয়ে গেছে- চিরদিনের মতো :

ভালোবাসা এসেছিল
এমন যে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।

বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে গেণু ধেয়ে।
তখন সে সুপ্ত কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা /

উল্লেখপঞ্জী :

১. মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম
২. রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ